সুন্দর হে সুন্দর

মীজান রহমান

আমার পাঠকদের অনেকেই জিজ্ঞেস করেছেন আমি অঙ্কের লোক হয়ে সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠলাম কেমন করে। আমি বলি, দু'টোকেই ভালবাসি বলে। একটি আমার বৈধ প্রেম, আরেকটি পরকীয়া। কোন্‌টা কি তা আমি ঠিক করে উঠতে পারিনি এখনো।

আসলে অঙ্ক আর সাহিত্যের মাঝে মৌলিক বিরোধ কোথায় ?

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের এক অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল একবার, সাঁতারের পুলে গিয়ে। কথায় কথায় উনি বললেন, জানেন, ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে কিন্তু অঙ্কের একটা সূক্ষ্ম মিল আছে। আমি তাঁর মন্তব্যকে লুফে নিয়ে বোকার মত বলে ফেললাম, অবশ্যই আছে। আমরা দু'জনই প্যাটার্ণ খুঁজি। দু'টিতেই ছন্দ আর প্রতিসাম্যের সন্ধিৎসা আছে।

অনেকদিন আগের কথা সেটা, যখন আমার লেখালেখির জীবন শুরু হয়নি। তখন হয়ত না বুঝেই বলেছিলাম কথাগুলো, আন্দাজে গুল মারা যাকে বলে। এখন মনে হয় ছিটেফোঁটা সত্য হয়ত ছিল তাতে। তবে পুরো ব্যাপারটা সম্ভবত আরো গভীর। শুধু ছন্দ আর সাম্য সন্ধানেই নয়, অন্তরের নিগূঢ় ধ্বনিমূলেও মিল আছে আমাদের। মহাশূন্যের একই তরঙ্গপ্রবাহে দোলায়িত আমরা। সত্যকে, সুন্দরকে, তার নিরাবরণ ও নিরাভরণ রূপে আবিষ্কার করবার যে নিরন্তর স্পৃহা, তাতে আমরা অভিন্ন। দু'জনেরই ধর্ম এক ঃ সৃষ্টি। কর্ম এক ঃ সত্যের খণ্ডিত রূপকে বিমূর্ত ও অখণ্ড অবয়বে চিত্রিত করা। ভিন্ন শুধু তাদের পথ, তাদের ভাষা। একজন খোঁজে নিখুঁত শব্দ, যে-শব্দ গান করে, বীণা বাজায়, অন্ধকারে প্রদীপ জ্বালায়. কখনোবা গর্জে ওঠে দারুণ রোষে। আরেকজন খোঁজে নিখুঁত উপপাদ্য, নির্ভুল তত্ব, যা কালের বেড়া ভেঙে কালাতীতের দরবারে পৌঁছে দেয় মানুষকে। দু'জনই নভোচারী।

ভাল কবি সাধারণত ভাল গাণিতিক বা ভাল বিজ্ঞানী হয় না। ভাল গাণিতিকও হয় না ভাল কবি বা ভাল শিল্পী। গণিত আর শিল্পকলায় গরমিল আছে বলে নয়, জৈবিক ও সামাজিক গণ্ডীবদ্ধতার কারণে। কিন্তু আলোকিত মন, সৃষ্টির অস্থিরতায় চিরচঞ্চল মন, আপন স্বভাব, মুক্ত বিচরণের আনন্দে, যত্রতত্র দৃষ্টি পাঠাবে, বার্তা পাঠাবে মিতালির। সব সৃষ্টির আদ্যমূল ঃ কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা।

ফ্রিম্যান ডাইসন নামক হালের এক বিখ্যাত গাণিতিক-বিজ্ঞানী একবার মন্তব্য করেছিলেন যে বিজ্ঞানীরা মোটামুটি দু'প্রকারের। এক, যারা ডোবার ব্যাঙ। দুই, যারা বনের পাখি। কথাটা শুধু বিজ্ঞানীদের বেলাতেই নয়, জ্ঞানবিজ্ঞানের সব শাখাতেই প্রযোজ্য বলে আমি মনে করি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত। সাধারণ শব্দটা হয়ত আবিষ্কারই হয়েছে তাদের জন্যে। নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীটুকু ছাড়া আর কিছু দেখবার ক্ষমতা তারা রাখে না। আমি নিজে তার ব্যতিক্রম নই। ব্যাঙ আর পাখির ব্যবধানটা ভাল করে বুঝবার আগে নিজের সম্বন্ধে একটা অসুস্থপ্রকারের উঁচু ধারণা পোষণ করতাম। দু'চারটে ডিগ্রি করার পর তো ধরা একেবারেই সরা হয়ে গেল — ভাবলাম এবার আমাকে থামায় কে ! পরবর্তীকালে সে-ভাবনার হাস্যকরতা যখন উদ্ঘাটিত হল তখন আয়নায় চেয়ে দেখি এক কর্দমাক্ত কুৎসিৎ মণ্ডুকের ছবি। জন্ম থেকে সেই যে কাদায় ঢুকেছি আমি তা থেকে একবারও বের হবার পথ খুঁজে পেলাম না। কাদাই আমার জগত হয়ে উঠল।

ক্বচিৎ কদাচিৎ দু'চারটে মানুষ জন্মায় যারা নিজেদের উদ্যমেই সেই কাদার কলঙ্ক থেকে উদ্ধার পায় একসময়। বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানভাণ্ডার মন্থন করে বিপুল ধনসম্ভার সংগ্রহ করবার বিরল ক্ষমতা তাদের আছে। সেই ক্ষমতার জাদুস্পর্শে তাদের গায়ে পাখা গজায়, এবং সেই পাখাতে করে তার যখন-তখন যেখানে-সেখানে উড়াল দিতে পারে। ক্ষুদ্র সীমানার ঊর্ধ্বে অবস্থান নিয়ে তারা মহতী বৃহতের উপস্থিতি অনুভব করে, অবলোকন করে। তারা জ্ঞানবৃক্ষের প্রতিটি শাখার মধ্যে সাযুজ্য ও সৌসাম্য দেখতে পায়। তাদের মধ্যে অনেকে শিক্ষায় বিজ্ঞানী হয়েও চিন্তায় দার্শনিক, চিকিৎসক হয়েও চারুশিল্পী, রাষ্ট্রদূত হয়েও কাব্যবিলাসী, প্রকৌশলী হয়েও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের একাগ্র সাধক। কর্দমবাসী মানুষ সরলেরেখায় চলে, তাদের পৃথিবী একমাত্রিক। অনেক সমাজ আছে যারা বহুমাত্রার মূল্য বোঝে না, বরং বিবিধ অনুশাসন দিয়ে তাদের সীমারেখাটিকে শাস্ত্রীয় মর্যাদায় গ্রন্থভুক্ত করে রাখে। মানবজাতির সার্বিক কল্যাণের জন্য এইসব একমাত্রিক জাতি বা মানুষ কখনোই কোন বড় অবদান রাখতে পারেনি। সাধারণ মানুষ, একমাত্রিক বিধিবদ্ধ মানুষ, পৃথিবী বদলায় না, মুক্ত শূন্যের ঊর্ধ্বচারী মানুষ বদলায়। তারা প্রকৃতির নানা বর্ণ ও নানা খণ্ডিত রূপকে সংযুক্ত করে একটি একক মূর্তি রচনা করে। পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ, কাদার মানুষ, তার অসামান্য সঙ্কীর্ণতা দিয়ে তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে একটি কুৎসিৎ রূপ দাঁড় করায়। ইতিহাসে যাঁরা বড় কিছু করেছেন, যাঁরা সভ্যতার জনক, বাহক ও ধারক, তাঁরা ডাইসন সাহেবের সেই বনের পাখিশ্রেণীর মানুষ। সেই বিরল শ্রেণীটারই দু'চারটে উদাহরণ টেনে আনব আজকে।

ছোটবেলায় মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের ওপর দারুণ আগ্রহ ছিল আমার, সম্ভবত মুসলিম পরিবার ও মুসলিম-প্রধান পরিবেশে জন্মগ্রহণের ফলেই। কবি আলাওল, জসিমুদ্দিন, ফররুখ আহমেদ, এঁরা তো বটেই, অবাঙালি কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে কৌতূহলী ছিলাম আমি ওমর খাইয়ামের প্রতি। তাঁর কবিতা হয়ত একটাও পড়িনি তখন, কিন্তু তাঁর নামের মহিমাতেই মুগ্ধ ছিলাম আমি। মনে হত, ভীষণ রোমাণ্টিক ছিলেন মানুষটি, এবং সে-সময়কার সুফী সম্প্রতদায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তারপর যখন কিছু পড়াশুনার সুযোগ হল তাঁর উপর, তখন ভীষণ লজ্জা পেলাম নিজের অজ্ঞতার সীমাহীনতায়। সুফীদের সমসাময়িক ব্যক্তি তিনি ছিলেন ঠিকই, কিন্তু সুফী মতবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তায় বিশ্বাসী। সংসারধর্মে সুফীদের আপাত বৈরাগ্যভাব ও তাদের ধ্যানভিত্তিক ঈশ্বরবন্দনার প্রতি বিন্দুমাত্র ভক্তি ছিল না তাঁর। তিনি ছিলেন জীবনবাদী মানুষ—জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার মন্ত্রে বিশ্বাসী। পরলোক বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব তিনি মানতেন না, সনাতন ধর্মকর্মে কোনরকম আস্থা ছিল না, ইহজাগতিক জীবনের প্রতিদিনকার রূপ বৈচিত্র্যই ছিল তাঁর পরম আরাধ্য বস্তু। কিন্তু ওমর খাইয়ামের আসল পরিচয়টা সেখানে নয়। আসল পরিচয় তাঁর অসামান্য মেধা ও চিন্তাজগতের বহুবিস্তৃত পরিসরের মধ্যে। বর্তমান যুগে তাঁর প্রধান পরিচয় এডওয়ার্ড ফিটজেরাল্ড-অনূদিত 'রুবায়েতে ওমর খাইয়াম'-এর মাধ্যমে হলেও তাঁর সমসাময়িক কালে তিনি পরিচিত ছিলেন

বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, গাণিতিক, গ্রহতাত্ত্বিক ও গবেষক হিসেবে। সত্যিকার অর্থেই তিনি ছিলেন এক বহুমুখী প্রতিভা, যার নিদারুণ অভাব আজকের প্রযুক্তিনির্ভর বিশেষজ্ঞময় পৃথিবীতে।

তৎকালীন তুর্কশাসিত পারস্যে ওমর খাইয়ামের সবচেয়ে বেশি খ্যাতি ছিল জ্যোতির্বিদ হিসেবে। এতটাই খ্যাতি যে সুলতান মালিক শাহ্ (যাঁর একাধিক নামের অন্যতম ছিল জালালুদ্দিন) তাঁকে 'জালালী সাল'-এর ক্যালেণ্ডার প্রণয়নের দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি এবং তাঁর সাত সহবিজ্ঞানী মিলে যে ক্যালেণ্ডার রচনা করলেন তার নির্ভুলতা সম্বন্ধে অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করেন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞরা। গিবন নামক এক ভদ্রলোক বলেছেন যে নির্ভুলতার ব্যাপারে 'জালালী' ক্যালেণ্ডার সেকালের প্রচলিত জুলিয়ান ক্যালেণ্ডারকে ছাড়িয়ে গেছে, এবং বর্তমানের গ্রেগরিয়ান ক্যালেণ্ডারের প্রায় সমান সমান বলা যায়।

কিন্তু যা আমার জানা ছিল না, যা আমাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে তাঁর প্রতি সেটা হল তাঁর গাণিতিক অবদান। গণিতের প্রতি সব বিজ্ঞানীদেরই একটা স্বাভাবিক টান থাকে, সে হিসেবে তাঁরও যে ছিল সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। আশ্চর্যের বিষয় হল গণিতগবেষণার একেবারে সামনের সারিতে একটা স্থায়ী স্থান দখল করে থাকা একজন মহাকবির। বীজগণিতের জনক যে ছিলেন বাগদাদের মোহাম্মদ ইব্‌নে মুসা আল খারিজ্‌মি বলে এক গবেষক তা মোটামুটি সবারই জানা। একটি দ্বিঘাত সমীকরণের (কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন) সমাধান থেকে একটি অজানা রাশির মান উদ্ধার করার যে-পদ্ধতিটা পৃথিবীর সব স্কুলেরই অঙ্কের ক্লাসে পড়ানো হয় সেটি এই খারিজ্‌মি সাহেবেরই দান। ওমর খাইয়ামের চেষ্টা ছিল ত্রিঘাত সমীকরণের রহস্য উদ্ঘাটন করা। আংশিকভাবে পেরেছিলেন, কিন্তু পুরো সমাধানটির জন্য গণিতজগতের অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরো পাঁচশ বছর। এ-প্রশ্নটির সঙ্গে যে আরো অনেক জটিল ও সূক্ষ্ম বিষয় জড়িত ছিল সেটা দ্বাদশ শতাব্দীর কোন গবেষকের পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বীজগণিতের আদিম ইতিহাসে ওমর খাইয়ামের নাম স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত।

বাইরের জগতে ওমর খাইয়ামের বিপুল জনপ্রিয়তার প্রধান উৎস অবশ্য তাঁর সেই অমর কাব্যগ্রন্থ, ফারসিভাষায় লিখিত ছ'শ পৃষ্ঠার যুগান্তকারী সৃষ্টি ঃ রুবায়েতে ওমর খাইয়াম। রুবায়েত শব্দটির আক্ষরিক ইংরেজি অনুবাদ Quatrain, যার বাংলা দাঁড়ায় চতুষ্পদী স্তবক। মার্কাস ডু সটয় সাহেব[১] তার গাণিতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে। খাইয়ামের চতুষ্পদীগুলোর ছন্দবিন্যাসের সঙ্গে গণিতের বৃত্তায়িত প্রতিসাম্যের সাদৃশ্য আছে। রুবায়েতগুলোর গঠন প্রধানত দু'রকম নিয়ম দ্বারা চালিত। একটা হল, যেমন AABA, তারপর BBCB। উদাহরণ ঃ

Ah, Love! could you and I with Fate conspire
To grasp this sorry Scheme of Things entire,
    Would not we shatter it to bits — and then
Re-mould it nearer to the Heart's Desire!

But see! The rising Moon of Heav'n again —
Looks for us, Sweet-heart, through the quivering Plane;
    How oft hereafter rising will she look
Among those leaves — for one of us in vain!

(Fitzerlad,[2] p.133)

অথবা, AABBCC... , যেমন

দ্রাক্ষা-মধু নয় কি বধূ – সৃষ্টি বিধাতার ?
নিন্দা করে আঙুর-রসের স্পর্ধা এত কার ?
    কে বলে এ পাপের ফাঁদ ?
    এ যে বিধির আশীর্বাদ,
পাত্র ভ'রে সমাদরে নিত্য করো পান,
হয় যদি এ অভিশাপই – সেও তো, তাঁরই দান।

(নরেন্দ্র দেব,[৩] ৭৭ পৃঃ)

অত্যন্ত নিপুণ নিখুঁত গাঁথুনিতে বাঁধা, সযত্নে শৃঙ্খলিত, ঠিক যেমনটি থাকে গণিতের মৌলিক তথ্যসমূহে। এই মিলগুলো লক্ষ্য করে ডু সটয়[১] মন্তব্য করেছেন ঃ "হয়ত একারণেই এতে অবাক হবার কিছু নেই যে ওমর খাইয়াম গণিত এবং কবিতাকে সমানভাবে ভালবাসতেন ও উপভোগ করতেন।" বীজগণিতের সেই শৈশবকালে ওমর খাইয়াম তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আরো একটি মূল্যবান জিনিস উপলব্ধি করেছিলেন যে বীজগণিত আর জ্যামিতির ভেতরে একটা আত্মিক সম্পর্ক আছে। জ্যামিতি দিয়ে বীজগণিতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যকে যেমন সহজভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, তেমনি জ্যামিতির অনেক সূত্রকেও প্রকাশ করা যায় বীজগণিতের সাহায্যে। অনেকটা সেকারণেই তিনি বিশ্বাস করতেন না যে ত্রিঘাত সমীকরণের ওপরে আর কোন মাত্রা থাকা সম্ভব, কারণ বাস্তব জগতে চতুর্থ বা পঞ্চম ... মাত্রা বলে কোনকিছুর অস্তিত্ব নেই। (আমরা যেন ভুলে না যাই যে যুগটা ছিল দ্বাদশ শতাব্দী, বহুমাত্রিক জ্যামিতির ধারণাসৃষ্টির যুগ থেকে প্রায় সাতশ' বছর আগে!)

ওমর খাইয়ামের গণিতের কাজ এবং কবিতার কাজ দু'টোকে পাশাপাশি রেখে মেলাবার চেষ্টা করে আমার মনে হয়েছে এটা শুধু জ্যামিতি আর আকৃতির সৌসাম্য নয়, একটা গূঢ় আভ্যন্তরীণ ছন্দমিলও আছে দুয়েতে। একই বেদীর পাদমূলে দুয়ের অর্ঘ্যাঞ্জলী দু'টি ভাষায়, দু'টি ভিন্ন পাত্রে। একই দেবীর পূজারি তারা। সে দেবীর নাম সৌন্দর্য। কবিতার সৌন্দর্য, যদি তা সত্যি সত্যি সুন্দর কবিতা হয়, যা সকালবেলার ফুলের মত ফুটে থাকে বাগানে যা কারোরই দৃষ্টি এড়ায় না। গণিতের সৌন্দর্য, যদি তা সত্যি সত্যি সুন্দর গণিত হয়, তা সলাজ কিশোরীর মত নেপথ্যের আড়ালে আত্মগোপন করে থাকে যা গণিতের আপন লোকেরা ছাড়া আর কারো কাছেই সহজে ধরা দিতে চায় না। জহরীই জহর চেনে, প্রবাদটি গণিতের বেলায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

আমার দীর্ঘ অধ্যাপনার জীবনে একটা প্রশ্ন বারবার শুনতে হয়েছে আমাকে ঃ স্যার, এ-তত্বটির প্রয়োগ কোথায় ? এত যে সব জটিল জিনিস আপনি শেখাচ্ছেন আমাদের, জীবনের কি কাজে লাগবে এগুলি ? সবে স্কুল থেকে পাস করে এসেছে ওরা, জীবনের কিছুই দেখেনি, কিছুই শেখেনি, কেমন করে বোঝাব ওদের গণিতের প্রয়োগ কোথায় জীবনে। কেমন করে বোঝাব ওদের, এই যে তারা বসে আছে বিশাল শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মিলনায়তনে, চারদিকে একশ' দেড়শ' পাওয়ারের আলো জ্বলছে, প্রকৌশলীদের নিখুঁত নির্মাণকর্মের স্বাক্ষর সর্বত্র, এর প্রতিটি পরতে পরতে রয়েছে অঙ্কের ছাপ। অঙ্ক ছাড়া বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞান করতে পারে না, যান্ত্রিকরা যন্ত্র বানাতে পারে না, ব্যবসায়ীরা পারে না তাদের ব্যবসা চালাতে। প্রতিটি মানুষ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতি পদে পদে, অলক্ষ্যে অজান্তে গণিতের কোন-না-কোন শাখার কোন-না-কোন সূত্র ব্যবহার করে যাচ্ছে। যে-শিল্পী আপন মনে ছবি এঁকে যাচ্ছে সে কি সজ্ঞানে ভেবে দেখেছে কখনো, দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির কত গূঢ় তত্ব সে ব্যবহার করে চলেছে প্রতিদিন ? যে-বাদক তার বেহালার সুরে পাগল করে তুলছে তার শ্রোতাদের সে কি কখনো কল্পনা করেছে তার বেহালার তারে গণিতের কত অজস্র রাশিমালা কত বিচিত্র ছন্দে নেচে বেড়াচ্ছে প্রতি পলে অনুপলে ? না, পারেনি। আমরা কেউ পারি না ভাবতে গণিত কত সূক্ষ্ম তন্তুতে গাঁথা অবয়বে, কত নিঃশব্দে নিরাকারে প্রবেশ করে আমাদের জীবনের আনাচে কানাচে। পারি না বলে অঙ্কের কঠিন বহিরাবয়ব দেখে আমরা বিভ্রান্ত হই, নির্বোধ প্রশ্ন করি ঃ অঙ্কের কি কোনও সঙ্গতি আছে বাস্তব জীবনে ?

বিশুদ্ধ গণিত আর বিশুদ্ধ কবিতা বা অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবির কি মৌলিক কোনও পার্থক্য আছে ? আমার তো মনে হয় না। সৃষ্টিশীল মানুষ সবসময়ই চাইবে তার সৃষ্টির একটা দেহমুক্ত বিশুদ্ধ মূর্তি রচনা করতে। সে চাইবে তার কাজের যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাকে স্পর্শের আড়ালে নিয়ে যেতে, তাকে বিমূর্তায়িত করতে। বস্তুকে নৈর্বস্তুক ও নৈর্ব্যক্তিক রূপে প্রকাশ করা, সব শিল্পীই বোধহয় চায় তা। সেই বিমূর্ত রূপের কি প্রতিফলন হল বা হল না বস্তুজগতে সেটা নিয়ে শিল্পীর খুব একটা ভাবনা নেই। সে তার কল্পনা আর কলম দিয়ে যে জগত সৃষ্টি করেছে সেখানে বায়ুচাপ সাধারণ নিয়ম মেনে চলে না। বিশুদ্ধ গণিতের জগতেও অনেকটা তাই। এক পর্যায়ে গণিত তার চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে অরূপের মাঝে। সেখানে সে কায়িক অবয়বশূন্য—সে নভোচারী মুক্ত বিহঙ্গ। সেই অরূপী রূপকে অবলোকন করবার শক্তি স্বভাবতই সবার নেই। যাদের থাকে তারাই একসময় ইতিহাস রচনা করে। তারা বিশ্বভুবন আলোকিত করে।

গণিত আর কবিতার সৌহার্দ্য উপলব্ধি করেছেন এমন দুয়েকজন ক্ষণজন্মা ব্যক্তির নাম উল্লেখ করব এখানে। প্রথমেই মনে আসে ষোড়শ শতাব্দীর অমর জ্যোতির্বিদ জোহান কেপ্‌লারের নাম। তিনি একবার লিখেছিলেন ঃ

> "Mathematics is the archetype of the beautiful."
> (গণিত হল সুন্দরের আদিরূপ)

সৌরমণ্ডলে গ্রহাদির নিজনিজ কক্ষপথে নিরন্তর আবর্তন বিষয়ে যে তত্বসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবইতে পড়েছি আমরা সবাই, তাঁর প্রণেতা ছিলেন এই কেপলার সাহেব। গ্রহতত্বের এই বিস্ময়কর ও যুগান্তকারী আবিষ্কারের পর তিনি নিজেকে অত্যন্ত ভাগ্যবান ও কৃতজ্ঞ মনে করেছিলেন যে আবিষ্কারের দায়িত্বটি তাঁরই ওপর অর্পিত হয়েছিল। সৌরজগতের এই আবর্তনকে তিনি বর্ণনা করেছিলেন এক নিটোল কাব্যিক ভাষায় ঃ music of the spheres (গোলকের গান)।

গ্রহতারা বিষয়ে আরেক কাব্যিক পণ্ডিত ছিলেন নোবেলবিজয়ী ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী সুব্রামানিয়াম চন্দ্রশেখর। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতত্বের (সমার্থে অভিকর্ষতত্ব) সমীকরণমালার পূর্ণ সমাধান আবিষ্কার করেছিলেন নিউজিল্যাণ্ডের বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ রয় কের। [৪,৭] সাধারণ আপেক্ষিকতত্বের ওপর অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য বিশ্বের যেক'জন বিজ্ঞানী বিশেষভাবে পরিচিত চন্দ্রশেখর ছিলেন তাঁদের অন্যতম। কের সাহেবের অভূতপূর্ব কৃতিত্বের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ[৪,৭]

"In my entire scientific life, extending over forty-five years, the most shattering experience has been the realization that [Kerr's] exact solution of Einstein's equations of general relations provides the <u>absolutely exact representation</u> of untold numbers of massive black holes that populate the universe. This 'shuddering before the beautiful', this incredible fact that a discovery motivated by a search after the beautiful in mathematics should find its exact replica in Nature, persuades me to say that beauty is that to which the human mind responds at its deepest and most profound."

"আমার ৪৫ বছরের দীর্ঘ বিজ্ঞানসাধনার জীবনে যে অভিজ্ঞতাটি সবচেয়ে প্রবলভাবে দোলা দিয়েছে আমাকে তা হল এই যে আইনস্টাইনের সমীকরণমালার পূর্ণ-সমাধান (কের) একাধারে যেমন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অগণিত কৃষ্ণবিবরের[৫] অস্তিত্ব প্রমাণ করেছে, তেমনি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করেছে বিশ্বপ্রকৃতির প্রকৃত স্বরূপ। এই উপলব্ধি, সৃষ্টিরহস্যের এই অত্যাশ্চার্য উন্মোচন, অকৃত্রিম সুন্দরের সম্মুখে বিনীত সাধকের এই যে শিহরিত কম্পন, বিশুদ্ধ গণিতের নিহিত রূপের সন্ধানে প্রকৃতির গহীনতম মঞ্চের যবনিকা উত্তোলন, এ-দৃশ্য অবলোকন করে সৌন্দর্যের একটি সংজ্ঞা দানা বেঁধেছে আমার মনে। মানুষের মনোজগতের গভীরতম প্রকোষ্ঠে যা দোলা দেয়, নাড়া দেয় তার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ দিয়ে, তারই নাম সৌন্দর্য।"

রূপের সুন্দরতম মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে বিনয়নম্র আনত বিজ্ঞানী তাঁর অতলান্ত অনুভূতিগুলোকে ছোট একটি শিশির মত পাত্রে করে প্রকাশ করার চেষ্টায় দু'টি ল্যাটিন উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন তাঁর নিবন্ধে ঃ [৪]

"The simple is the seal of the true."
(সরলই সত্যের অবয়ব)

"Beauty is the splendour of truth."
(সুন্দর হল সত্যের উজ্জ্বলতা)

পেশাগতভাবে চন্দ্রশেখর ছিলেন, যাকে বলে, তাত্ত্বিক পদার্থবিদ, বা গাণিতিক পদার্থবিদ। অর্থাৎ তিনি বস্তুজগতকে গণিতের আরশি দিয়ে দেখতেন। তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন প্রথম যৌবনে আবিষ্কৃত 'শ্বেতবামন' (White Dwarf) নামক মহাশূন্যস্থিত এক মৃতপ্রায় অথচ অবিশ্বাস্যরকম ঘনত্বপূর্ণ তারকা আবিষ্কারের জন্য। অথচ তাঁর ৮৫ বছর জীবনের দীর্ঘ জ্ঞানসাধনার সবচেয়ে কেন্দ্রবস্তু ছিল চিররহস্যময় কৃষ্ণবিবর, যার পুরো গাণিতিক তত্ত্বটি বলতে গেলে তাঁরই আবিষ্কার। কিন্তু এ-আবিষ্কার তিনি কোনও সুদূর মানমন্দিরে অবস্থিত বীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে করেননি, করেছিলেন তাঁরই আপন মস্তিষ্কপ্রসূত দুরূহ গণিতের সাহায্যে। বাইরের মানুষের কাছে সে-গণিত যতই দুরূহ আর দুর্বোধ্যই মনে হোক, তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে সত্যিকারের কোন সুন্দর ধারণা যখন জন্ম নেয় মানুষের কল্পনাতে তখন তার একটা বাস্তব প্রতিচ্ছবি প্রকৃতির মাঝেই লুকিয়ে থাকে কোথাও-না-কোথাও। সুন্দর ও সাবলীলের প্রকৃতিই তা — যা কল্পনায় আছে তা বাস্তবে আছে, থাকতেই হবে। সৃষ্টিশীল মানুষের কল্পনা তো প্রকৃতিরই সৃষ্টি। কল্পনার সুন্দর বাস্তবেরই প্রতিফলন। একে অন্যের প্রতিবিম্ব। এ-সত্যটি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই হয়ত অ্যালবার্ট আইনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন ঃ "প্রকৃতির চিরন্তন রহস্য হল এর বোধগম্যতা।" চন্দ্রশেখরের (যাঁকে তাঁর বন্ধুরা চন্দ্র বলে ডাকত, এমনকি নাসা'র একটি গ্রহসন্ধানী নভোযানের নামকরণই করা হয়েছে চন্দ্র নামে) জীবন যেমন ছিল চিরচঞ্চল বৈচিত্র্য আর কাব্যিক অনুভূতিতে আবিষ্ট, মৃত্যুও ছিল তেমনি কাব্যিক সুষমা ও মাধুর্যে পরিপূর্ণ। ২১ আগস্ট, ১৯৯৫ সাল, সকালবেলা বুকের ব্যথা নিয়ে ঘুম থেকে উঠে গেলেন। বুঝলেন কি ঘটতে যাচ্ছে। স্ত্রী ললিতা কাছে শোয়া, বিভোর ঘুমে। জাগালেন না। আস্তে করে দরজা খুলে গাড়ি নিয়ে সোজা চলে গেলেন হাসপাতালে। হৃদক্রিয়া চরম অবস্থায়। কয়েক ঘণ্টার মাঝেই শেষ। পাশে তাঁর জীবনসঙ্গিনী বসা।

ফ্রিম্যান ডাইসন কার্য্যত গাণিতিক পদার্থবিদ হলেও ফলিত বিজ্ঞানের প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধা ও আস্থা ছিল তাঁর। একবার তিনি বিদ্যুৎ-পরমাণুর (electron) গতিপ্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করছিলেন গভীর মনোযোগ দিয়ে।[৪] কোনও গবেষণাগারে নয়, নিজের চিন্তা ও বুদ্ধি খাটিয়ে, আধুনিক গণিতের সাহায্যে। তাঁর টেবিলের ওপর একটি তেলের ফোঁটা। স্পষ্টই দেখতে পারছিলেন তাঁর বিদগ্ধ জ্ঞানচক্ষুতে, সেই ফোঁটার ঠিক চূড়াতে বড় বড় চোখ করে দাঁড়িয়ে আছে ইয়াব্বড় এক পরমাণু। যেন ঠাট্টা করছে তাঁর গবেষণা নিয়ে ঃ "কি পণ্ডিতমশাই, আমার প্রেমে পড়েছ বুঝি ? আহারনিদ্রা ত্যাগ করে গবেষণা করা হচ্ছে আমাকে নিয়ে ? তোমার প্রেম আর গবেষণার খোড়াই পরোয়া করি। তুমি অঙ্ক কষে যে-পথ বাৎলে দেবে আমাকে সে পথেই আমাকে চলতে হবে ? তাই বুঝি ভেবেছ তুমি ? ডাক্তার দিয়ে মাথাটা পরীক্ষা করে নাও।" কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত বিজ্ঞানীদেরও ঠিক একই ধারণা ছিল — প্রকৃতি একেবারেই গ্রাহ্য করে না মানুষ কি ধ্যানধারণা পোষণ করে তার গতিবিধি সম্পর্কে। কিন্তু ডাইসন সাহেব তাঁর গাণিতিক গণনার মনঃপুত সমাধান পাবার পর হঠাৎ একটা অপার্থিব সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেলেন ঃ বাস্তব আসলে তা নয়। বিজ্ঞান আর গণিত যদি সুন্দর ও সুরম্য হয় তাহলে বিদ্যু-পরামাণুর কোনও উপায় নেই সেই গণিতসম্মত পথ লঙ্ঘন করে অন্য কোন পথ অবলম্বন করা।

অসাধারণ গভীরতাপূর্ণ পর্যবেক্ষণ, তাই না ?

বিজ্ঞানজগতে আমার অনেক হিরোর মধ্যে একজন ছিলেন এরউইন শ্রেডিঞ্জার (১৮৮৭-১৯৬১)। শ্রেডিঞ্জারের সমীকরণ, যার ভেতর একটি কাল্পনিক সংখ্যা ($\sqrt{-1}$) অত্যন্ত আবশ্যিকভাবেই বিদ্যমান, পরমাণুজগতের গভীরতম রহস্যসমূহকে অকাট্যভাবে ব্যক্ত করে। Quantum Mechanics শাস্ত্রে এই অমর অবদানের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু শুধু সে-কারণে তিনি আমার হিরো হয়ে ওঠেননি। হিরো হয়েছেন তাঁর মনোজগতের দিগন্তপ্রসারী ব্যাপ্তির জন্য। তিনি ছিলেন অসাধারণ এক জীবনবাদী মানুষ। ভীষণ আমুদে আর রসিক মানুষ ছিলেন। সুন্দরী মেয়েদের (কিছু বিবাহিতাদেরও) কাছে প্রেম নিবেদন করতেন সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখে। বড় কথা, তিনি ছিলেন সত্য ও সুন্দরের উপাসক, — সে-সুন্দর আর সে-সত্যের প্রকাশ যেখানেই হোক। গাণিতিক পদার্থবিদ্যায় তিনি ছিলেন বিশ্বমানের বিশেষজ্ঞ, অথচ বিশেষজ্ঞতার সঙ্কীর্ণতা ও মণ্ডুকমনস্কতার ওপর তীব্র কটাক্ষ করেছেন তাঁর অসংখ্য লেখালেখি ও বক্তৃতায়। তিনি কবিতা ও সঙ্গীত ভালবাসতেন। নানা দেশ ও নানা সংস্কৃতির জ্ঞানীগুণীদের সৃষ্টিশীল কাজের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ার ছিলেন তাঁর প্রিয় ব্যক্তি। শোপেনহাওয়ার ভারতের উপনিষদ সম্পর্কে অত্যন্ত উঁচু ধারণা পোষণ করতেন। সে-সুবাদে শ্রেডিঞ্জার নিজেও আকৃষ্ট হয়ে পড়েন উপনিষদের প্রতি। কথিত আছে যে তাঁর বিজ্ঞানসাধনার জীবনে উপনিষদের প্রভাব ছিল অনেকটাই। সৃষ্টিশীল মানুষের সৃষ্টিকর্মের মূল্যায়ন বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আশ্চর্যকর উদার ও আলোকিত। মানুষের জীবনে প্রকৃতিবিজ্ঞানের (Natural Sciences) কি মূল্য সে-সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন ঃ "Its scope, aim and value is the same as that of any other branch of human knowledge.[৬] (এর পরিসর, লক্ষ্য ও মূল্য যা তার চেয়ে কোন অংশেই কম নয় জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্য যেকোন শাখা)।

বিজ্ঞানের কোন এক মনীষী একজায়গায় লিখেছিলেন (লোকটার নাম আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না। কথাগুলিই কেবল লিখে রেখেছিলাম যত্ন করে) ঃ "There is nothing to preclude a person from applying the logic of his mind to do mathematics or science, and the music of his mind to enjoy the beauty of the wilderness as well as the thrill of pure poetry." (কোন বাধাই নেই এতে যে একই মানুষ তার মনের যুক্তি আর বুদ্ধি দিয়ে গণিত বা বিজ্ঞানের সাধনা করবে, এবং তার হৃদয়ের গান আর সুর দিয়ে অরণ্যের বুনো সৌন্দর্য উপভোগ করবে, বিশুদ্ধ কবিতার পুলকে হবে শিহরিত)।

আমার পাঠকদের কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে পৃথিবীর বড় বড় মুনিঋষিদের নিয়ে এলাম আলোচনাতে। এ আমার ধৃষ্টতা, জানি। এঁদের যেকোন একজনের পাশে আমাকে দাঁড় করিয়ে তুলনা করবার চেষ্টা যদি কেউ করে তাহলে অকুহুলেই তাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানো উচিত। তবে এই মহাপুরুষদের সুরে সুর মিলিয়ে আমার একটা ছোট্ট নিবেদন আছে বৈকি। আমি যে গণিত করি তা এমন গভীর কিছু নয়, অনেকে হয়ত খুব হালকা বলেই আখ্যায়িত করবে তাকে। তবু এই ক্ষুদ্র বৃত্তটিতেই আমার মত ক্ষুদ্র পূজারীর আরামের বাসস্থান। গবেষণার জীবন যাঁদের তাঁরা ভাল করেই বুঝবেন আমি কি বলতে চাইছি। অনেক সময় একটা ফল খুঁজতে গিয়ে দিনের পর দিন কেটে যায়, কখনো কখনো মাস ছ'মাস কেটে যায় একই ভাবনাতে। তখন আমি এখানে থাকি না, অন্য কোথাও চলে যাই। খাওয়া, ঘুম, আরাম, বিনোদন, কোনকিছুতেই রুচি নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় মাথায় গোবর নিয়ে জন্মেছি বলেই হয়ত এ-অবস্থা। তারপর হয়ত হঠাৎ করেই দরজা খুলে গেল কখন। আলোতে, আলোতে ভেসে গেল ঘরদোর, দালান, রাস্তা, পৃথিবী। ছুটে যাই টেবিলে। আলোটাকে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টায় পাগলের মত টুকে নিই কাগজে। পরের দিন অবসন্ন দেহে তাকাই আমার কাজের দিকে। অধিকাংশ বেলায় হতাশায় ভরে ওঠে বুক। কি আজেবাজে জিনিস বের হল মাথা থেকে। এর কোন মানেই হয় না। চরম বিরক্তিতে কাগজপত্র সব ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে বিনে ফেলে দিই। ক্বচিৎ কদাচিৎ হয়ত দেবীর দেখা পাই। আমার বিনীত সৃষ্টি মিষ্টি করে হাসে আমার দিকে। অত্যন্ত সুন্দর দেখায় তাকে। কানা ছেলে তার মায়ের পদ্মলোচন'ও হতে পারে, তবু সে আমার পদ্মলোচন। তখন, সেই স্বর্গীয় মুহূর্তে, আমারও মনে হয়, যা বের হয়েছে আমার মস্তিষ্ক থেকে, তা সত্য না হয়ে পারে না। সত্য হওয়া ছাড়া তার কোন গত্যন্তর নেই, কারণ তা নাহলে সে এত সুন্দর আর সাবলীল হয় কেমন করে ?

তাই, আমি বুঝি, সবটা না হলেও কিছুটা বুঝি, কেন বড় বড় মনীষীরা বারবার একই কথা বলে গেছেন ঃ সুন্দরই সত্য। সত্য তাকে হতেই হবে। সত্য না হলে সংসারের কোনকিছুই সুন্দর হতে পারে না, সেটা কবিতাই হোক আর গণিতই হোক ॥

---

[১] "Symmetry", Marcus du Sautoy, Harper Collins Publishers, 2008

[২] "Rubaiyat of Omar Khayyam", Edward Fitzerald, Garden City Books, 1952

[৩] "রোবাইয়াৎ ই ওমর খেয়াম", শ্রীনরেন্দ্র দেব, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ষোড়শ সংস্করণ, ১৯৬০

[৪] "The Oxford Book of Modern Science Writing", Ricard Dawkins, Oxford University Press, 2008

[৫] "ফিরে ফিরে দেখা আমাদের এই মহাবিশ্ব", হারুণ-অর-রশীদ, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১

[৬] "Nature and the Greeks", and "Science and Humanism", Erwin Schrödinger, Cambridge University Press (1954, and 1951, respectively), Carto edition, 1996

[৭] "Empire of the Stars", Arthur I. Miller, Little Brown, 2005

অটোয়া,
৬ই ডিসেম্বর, ২০০৮
মুক্তিসন ৩৭